গোয়েন্দা সংস্থার সাবেক প্রধানদের কথা

বাংলাদেশে ‘র’

আগ্রাসী গুপ্তচরবৃত্তির স্বরূপ সন্ধান

আবু রূশ্‌দ

Radiant Leaf
Publishing

লেখকের কথা

'র'-অর্থাৎ Research and Analysis Wing ভারতের বৈদেশিক গুপ্তচর সংস্থার নাম। ১৯৬৮ সালে তদানীন্তন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী এই সংস্থাটি গঠন করেন। যেই উদ্দেশ্য নিয়ে ইন্দিরা গান্ধী RAW প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জন্মের মাত্র তিন বছরের মাথায় সেই উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ সৃষ্টিতে 'র' যে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এর মাত্র চার বছরের মাথায় 'র'-এর সার্বিক সহযোগিতায় ভারত সিকিম দখলেও সক্ষম হয়। তাই 'র' সম্পর্কে বলতে গিয়ে 'The Illustrated Weekly of India' মন্তব্য করেছে, "RAW's major triumphs in external intelligence were in Bangladesh and Sikkim".

এরপর কিন্তু 'র' থেমে থাকেনি। বরং ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রতিটি স্তরে ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা তার তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশে ভারতের 'বন্ধু সরকারও' 'র '-এর আগ্রামী গুপ্তচরবৃত্তি থেকে রেহাই পায়নি।

গুপ্তচরবৃত্তি পৃথিবীতে নতুন কোন বিষয় নয়। বরং এটি পৃথিবীর দ্বিতীয় প্রাচীনতম পেশা এবং প্রতিটি দেশেই গুপ্তচর সংস্থা আছে- এটা স্বীকৃত সত্য। আবার শুধু যে নিবর্তনবাদী বা স্বৈরতান্ত্রিক পথে চলা দেশেই ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি অতিমাত্রায় তৎপর থাকে তা নয়, বরং গণতান্ত্রিক দেশেও জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য গুপ্তচর সংস্থার প্রয়োজনীয়তা অবধারিত। বিশেষ করে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় যেখানে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, পত্র-পত্রিকা প্রকাশের অবারিত ধারা উন্মুক্ত থাকে সেখানে বৈরী শক্তির তৎপরতাও চলে গণতান্ত্রিক উদারতার সুযোগ কাজে লাগিয়ে। তাই রাষ্ট্রকে নিরাপদ রাখার জন্য প্রয়োজন হয় শক্তিশালী গুপ্তচর সংগঠনের। এক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিআইএ, ইংল্যান্ডের এম-১৬, ইসরাইলের মোসাদ ও ভারতের 'র'-এর নাম উল্লেখ করা যায়। লক্ষ্য করে দেখা যায়, পৃথিবীর যে দেশগুলোয় গণতান্ত্রিক অবকাঠামো যতো শক্তিশালী সেসব দেশের গুপ্তচর সংস্থার তৎপরতা, অবকাঠামোও ততোটা ব্যাপ্ত, সমন্বিত ও আধুনিক।

এদিকে সাধারণভাবে বলা যায় যে, গুপ্তচরবৃত্তি সাধারণত তিন প্রকারের- Strategical অর্থাৎ কৌশলগত, Tactical অর্থাৎ মাঠ পর্যায়ের ও Counter Intelligence অর্থাৎ প্রতি গোয়েন্দা তৎপরতা।এখানে স্ট্র্যাটেজিক্যাল গুপ্তচরবৃত্তি সম্পর্কে বলা যায়, একটি অনেক ব্যাপক পরিসরে পরিচালিত হয়ে থাকে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামরিক ইত্যাদি সকল বিষয়েই বিস্তৃত পরিসরে কৌশলগত গুপ্তচরবৃত্তি চালানো হয়। টার্গেট দেশের সামরিক শক্তি কিরূপ, ভবিষ্যতে কেমন হতে পারে, এক্ষেত্রে হুমকির খাতসমূহ কি কি বা সাংস্কৃতিক পর্যায়ে শত্রু দেশের সংস্কৃতিকে কিভাবে ধ্বংস করা যায় ইত্যাদি

সবাই বইটিকে রেফারেন্স হিসাবে বিবেচনা করবেন এই কামনা করছি। নানা রকম ছক কাটার যে মানসিকতা অনেকের মধ্যে রয়েছে আশাকরি পাঠকরা সেটার বাইরে এসে এর তথ্য, উপাত্ত গুলোকে মূল্যায়ন করবেন। বাংলাদেশে প্রতিরক্ষা ও গোয়েন্দা কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকতা আমার হাত দিয়েই শুরু হয়েছিল। এই বইটি তারই একটি ক্ষুদ্র উদাহরন মাত্র। একে গ্রহন করা ও মূল্যায়ন করা পাঠকদের উপর ছেড়ে দিলাম।

আবু রূশ্‌দ

ঢাকা

০১ নভেম্বর ২০২১

অধ্যায়-১

এসপিওনাজ কি, কেন, কীভাবে

বাংলাদেশের প্রখ্যাত লেখক কাজী আনোয়ার হোসেন তার বিখ্যাত 'মাসুদ রানা' সিরিজ-এর ৪৭তম সংখ্যা 'এসপিওনাজ'-এ গুপ্তচরবৃত্তির উপর চমৎকার একটি বিবরণ দিয়েছেন। এসপিওনাজ জগতের অন্ধকার চোরাগলিতে অনেকেই কীভাবে জেনে বা না জেনে হারিয়ে যান তা ঐ বইতে ফুটে উঠেছে এভাবে- "মোহাম্মদ ফারুক আলমগীর ঢাকার একটি দৈনিক পত্রিকার রিপোর্টার। রুচিশীল সংস্কৃতিবানের লেবাস। নিজেকে সংস্কৃতিবান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে বেশ কয়েক বছর কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে আলমগীরকে। প্রথমেই প্রমাণ করতে হয়েছে সে রবীন্দ্র সঙ্গীতের ভক্ত। পাকিস্তানি আমলে এটা ছিল একটা বিদ্রোহের মত। ওর কাছে কালচারের প্রধান মানদন্ড ছিল কে কতটা বুঁদ হতে পারে রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনে। সেই সাথে যদি গায়ে হালকা সেন্টের মতো মস্কোপন্থীর গন্ধ থাকে তাহলে তো কথাই নেই; রীতিমতো প্রোগ্রেসিভ ... একইভাবে বাড়তে বাড়তে কপালে সিঁদুরে টিপ আর মেঝেতে চন্দনের আলপনা দেখলেই চোখ ঢুলুঢুলু হয়ে আসা অভ্যাস করেছে সে। ... ক্রমে বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে তার এসবই হচ্ছে সত্যিকার সংস্কৃতি ও বাঙালিত্বের লক্ষণ। পয়লা বৈশাখে সাতসকালে উঠে একদল ছেলে-মেয়ে একসাথে জুটে জুতসই কোন বটমূলে সদলবলে 'এসো হে-এ-এ-বৈশাখ' বলে হাঁক ছাড়া যেন খুবই দরকার। ... ঘঁষে-মেজে নিজেকে সে এতই সংস্কৃতিবান করে ফেলেছিল যে- শেষে ঈদ, বকরিদ, শবেবরাত বা মিলাদ শরীফ তার কাছে রীতিমতো রুচিহীন, মুসলমানি, কমিউনাল ব্যাপার-স্যাপার বলে মনে হয়েছে। কেন যে নিজের নামটা তার কাছে সহ্য হয়েছে, ঘেন্নার ব্যাপার বলে মনে হয়নি, বলা মুশকিল।

... একাত্তরের গোলমালে ভেগেছিল কলকাতায়। কোন আদর্শের জন্য নয়, প্রাণভয়ে। সত্যিকার বাঙালি পেয়ে খুশি হয়ে 'দাদারা' অনেক সুবিধে দিয়েছেন ওকে। খাওয়া-থাকার কোনই অসুবিধে ছিল না। একটু-আধটু পানাভ্যাস ছিল দোষ হিসেবে নয়, ইসলাম ধর্মে বারণ আছে বলে বিদ্রোহ হিসেবে। সেদিক থেকেও অনুকূল হাওয়া দিয়েছেন তারা, জুটিয়ে দিয়েছেন কবিতা রায়ের মত সুন্দরী বান্ধবী। অর্থাৎ শুধু টোপই নয়; বড়শি, সুতো, ফাৎনা, মায় ছিপ পর্যন্ত গিলে বসে আছে সে। আটকা পড়েছে কবিতার মায়া জালে।

তেষট্টির রায়টে দেশ ছেড়ে কলকাতায় চলে গিয়েছিল কবিতারা। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ফিরে এসেছে বেদখল হয়ে যাওয়া সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করা যায় কি-না দেখতে। বড় ভাই অমলেশ, আর সে। ... ইদানীং কি যেন অল্প টের পাচ্ছে আমলগীর। কিন্তু এখনো এতে ঘোরের মধ্যে রয়েছে যে, বললে বিশ্বাসই করবে না, এরা দু'জনই আসলে ভারতীয় গুপ্তচর বিভাগের বিশেষ ট্রেনিং পাওয়া স্পেশাল এজেন্ট।

স্বাধীনতার পরপরই কলকাতা থেকে ঝাড়কে ঝাড় আসতে শুরু করলো রথী মহারথীরা। এ দেশের শিল্প-সাহিত্যের মানোন্নয়ন ও দিকনির্দেশের গার্জেনসুলভ মনোভাব নিয়ে ...। বিশেষ কার্ড দিয়ে ভারতীয় ছবি দেখবার অনুরোধ, কবিতার মাধ্যমে কূটনীতিকের সাথে ব্যক্তিগত পরিচয়-মদ্যপান চলতে থাকল এসব। সে সাথে আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে এল কবিতা। নিজের অজান্তেই একটা দু'টো করে তথ্য দিতে শুরু করলো আলমগীর। পত্রিকার পলিসি, কোন মিনিস্টারের কি মনোভাব, কোন ফ্যাকশন কি ভাবছে, নতুন কোন পরিবর্তন ঘটতে যাচ্ছে কি-না সবই অগ্রীম জেনে নিচ্ছে তারা। প্রথমদিকে এসব জানানোকে ঋণ পরিশোধ হিসেবে গ্রহণ করেছিল সে ... ধীরে ধীরে ওকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে দেশদ্রোহিতার দিকে। ... ওকে যে পুরোদস্তুর এজেন্টে পরিণত করবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে, ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে বানের জলে, ঠেলে দেওয়া হচ্ছে এমন এক জায়গায়-যেখান থেকে ফিরবার পথ নেই, ঘুণাক্ষরেও টের পেল না বেচারি।”

যদিও উপরের বর্ণনা একটি `Spy Fiction’-এর ঘটনা ছাড়া কিছুই নয়, কিন্তু ‘এসপিওনাজ’ জগতের এক উজ্জ্বল বিবরণ লেখক তার বইটিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। এবার ‘এসপিওনাজ’ সম্পর্কিত ‘একাডেমিক’ বা তথ্যগত বর্ণনা প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন।

১। এসপিওনাজ কী ও কেন

বর্তমান বিশ্বে একটি দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বা তার সম্ভাব্য শত্রু(Potential enemy) নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা খোলামেলাভাবে (Overt) কূটনৈতিক সূত্র, প্রেস, রেডিও, টিভি বা জার্নাল থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি ও এর বিশ্লেষণ করাই যথেষ্ট নয়, সে ক্ষেত্রে গোপনে বা পরোক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ করা একান্ত প্রয়োজন। তবে যে তথ্য জাতীয় নিরাপত্তার জন্য দরকার তা Hostile বা শত্রুভাবাপন্ন দেশ অবশ্যই নিরাপদে সংরক্ষণ করে আর সে জন্য তা সংগ্রহ করতে হয় গোপনে ও ধরা না পড়ে সম্পূর্ণ ‘জানি না’ ভান করে। এসপিওনাজকে প্রকৃতার্থে উল্লেখ করা যায় এভাবে, ‘যে গোপন/পরোক্ষ (Covert) উপায়ে কোন দেশ, সংস্থা বা ব্যক্তি তার জাতীয় নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় কোন তথ্য সংগ্রহ করে বা করার চেষ্টা করে’ তাকে এসপিওনাজ বলা যেতে পারে।

২। এসপিওনাজের প্রকৃতি

সাধারণত একটি এসপিওনাজ অপারেশন যখন ‘চুপচাপ’ ধরা না পড়ে সফল হয়, তখন তাকে সম্পূর্ণ সাফল্যজনক বলা যায়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে সুপরিকল্পিত বিশেষ ব্যবস্থা নেয়ারও প্রয়োজন পড়ে। সাধারণত এসপিওনাজ অপারেশন দু'ভাবে সম্পন্ন করা হয়।

ক। প্রচ্ছন্নভাবে (Clandestinely)

এক্ষেত্রে গোপনে কার্যসিদ্ধি করা হয় কিন্তু এর কোন ‘ছদ্মাবরণ’ থাকে না। যেমন পার্বত্য চট্টগ্রামে ভারতীয় ‘র’-এর হস্তক্ষেপ সর্বজনবিদিত কিন্তু এতে সরাসরি ‘র’-এর

অধ্যায়-৩

‘র’ কেন বাংলাদেশ বিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত

‘র’-এর গুপ্তচরবৃত্তির প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন ও তৎপরবর্তী পরিচালিত কয়েক ধরনের স্ট্র্যাটেজি ও বাংলাদেশ বিরোধী তৎপরতার বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন। ১৯৬৮ সালে ‘র’ গঠিত হয়েছিল মূলত বৈদেশিক গুপ্তচরবৃত্তি পরিচালনার জন্য। এর পূর্বে আইবি (Intelligence Bureau) এতদসংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করতো। তখন স্বভাবতই প্রশাসনিক ক্যাডার ও পুলিশ বাহিনীর লোকজন দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় তাদের গুপ্তচরবৃত্তির প্রকৃতি ছিল অনেকটা ‘আমলাতান্ত্রিক লাল ফিতার জটিলতায়’ আক্রান্ত ধীর, শ্লথ ও কোন কোন ক্ষেত্রে ‘হতাশাপূর্ণ’। কিন্তু ‘র’ গঠন করার পর ইন্দিরা গান্ধীর মতো একজন তুখোড় স্টেটসম্যান আধুনিক ধ্যান ধারণার পরিপূর্ণ সুযোগকে কাজে লাগান; তবে সার্বিকভাবে ভারতীয় রাজনীতিবিদরা ‘চানক্যের’ গুপ্তচরবৃত্তির দর্শনকেই মৌলিক চেতনা হিসেবে বেছে নেন। যার ফলশ্রুতিতে ভারত তৃতীয় বিশ্বের একটি হতদরিদ্র, শত অভ্যন্তরীণ সমস্যাসঙ্কুল দেশ হওয়া সত্ত্বেও ‘র’ গঠনের মাত্র তিন বছরের মধ্যে ‘বাংলাদেশ অপারেশনের’ মাধ্যমে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র তৈরিতে সুচারুরূপে সমর্থ হয়। পক্ষান্তরে প্রাচীন ধ্যান-ধারণা পোষণকারী কেবলমাত্র সামরিক প্রাধান্যে পরিচালত পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা-আইএসআই পরিস্থিতিকে ‘হযবরল’ অবস্থায় নিয়ে যায়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ হতে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত পরিচালিত ‘র’ কার্যক্রমে মৌলিক কিছু পরিবর্তন হয়নি বলে ধরে নেওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। সে সময় আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারত আমাদের সহায়তা করেছে ও অতিদ্রুত স্বাধীনতা লাভে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রথম হতেই আমাদের তৎকালীন জাতীয়তাবাদী নেতাদের সাথে আইবি ও পরবর্তীতে ‘র’ কর্মকর্তারা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ অব্যাহত রাখেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ‘র’-এর সক্রিয় প্রশিক্ষণ পরিচালনা, ভারত ও বাংলাদেশ সরকারকে হানাদার পাকবাহিনীর রণকৌশল সম্পর্কে বিশ্লেষণাত্মক উপদেশ প্রদান, গেরিলা যুদ্ধের রাজনৈতিক ও সামরিক লক্ষ্য হাসিলে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সর্বশেষে সম্মুখ যুদ্ধে ব্যাপক ইন্টেলিজেন্স তৎপরতা বিশেষভাবে স্মরণীয়। তখন বাংলাদেশ সরকারের কোনো প্রতিষ্ঠিত ইন্টেলিজেন্স সংস্থা না থাকায় ‘র’ আমাদের সকল প্রয়োজন পূরণ না করলেও বেশিরভাগ প্রয়োজন মেটাতো। স্বাভাবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে মনে হবে-‘অহিংস’ ভারত মানবতার অপমানে লজ্জিত হয়ে কি মানবিক আচরণই না প্রদর্শন করলো! তবে ভারতের মনোভাব বা সহায়তার পেছনের ইতিহাস সম্পূর্ণ না টেনেও শুধু ‘গোপন সাত দফা চুক্তি’র কথাটি যদি কোন স্বাধীনচেতা

বাংলাদেশি ভেবে দেখেন (যা প্রস্তুত করেছিল 'র' কর্মকর্তারা), তবে পৃথিবীতে ভারতের পরিচয় অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠবে, যা উপলব্ধি করতে পেরে তৎকালীন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাত দফা চুক্তিতে বাধ্য হয়ে স্বাক্ষর করার পর মুর্ছা গিয়েছিলেন। আসলে 'শতাব্দীর সুযোগ'কে তারা এমনি এমনিই কাজে লাগায়নি। বরং এর পেছনে যে আজন্ম লালিত আর্য-চানক্য নীতির প্রভাব ছিল তা বলাইবাহুল্য। যদি তাই না হবে তবে ভারত কেন পরবর্তীতে ফারাক্কা চালু করে চরম অমানবিক কাজ করল? কেন আজ ভারত সর্বকালের সর্বনিম্ন পর্যায়ের পানি দয়া (!) করে বাংলাদেশকে দিয়ে চার কোটি মানুষকে প্রত্যক্ষভাবে চরম অমানবিক কায়দায় শুকিয়ে মারছে? কেন সৃষ্টি করেছে শান্তিবাহিনী, বঙ্গসেনা, মোহাজির সংঘের মতো সংগঠনের? অনেকেই হয়তো এ কথাটি জানেন না যে, ১৬ ডিসেম্বরের পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণের দলিলটিও প্রস্তুত করেছিল 'র'-এর কর্মকর্তারা। 'নিয়াজী আত্মসমর্পণে রাজি হওয়ার পর 'র'-এর অফিস হতেই আত্মসমর্পণের চুক্তিমালা প্রণয়ন করা হয়'।[১] এবং 'র'ই অবশেষে ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে শেখ মুজিব সরকারকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে'।[২] 'র'-এর কর্মকর্তারা এতো বড় কাজ শুধুমাত্র আমাদের স্বাধীনতায় খুশি হয়ে সম্পাদন করেনি। বরং নিজ স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যেই তারা এ ভূমিকা পালন করেছিল ও এখনো করছে। তাই দেখা যায়, বাংলাদেশে 'বন্ধুপ্রতীম দল' ক্ষমতাসীন না হলে ভারত 'বন্ধুত্ব'কে ছুড়ে ফেলে দেয় দূরে, বহুদূরে।

এদিকে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করার সময় এ উপমহাদেশের সামরিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোকে ভারতের কয়েকটি বিশেষ লক্ষ্য ছিল বলে ধরে নেওয়া যায়।

প্রথমত: চির বৈরী পাকিস্তানকে দুর্বল করে দিয়ে সামরিক, অর্থনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা এবং ১৯৬২ ও '৬৫ সালের যুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনী যে পেশাগত দুর্নামের ভাগীদার হয় তা দূর করার মাধ্যমে হীনমন্যতার বীজ নষ্ট করে দেওয়া।

দ্বিতীয়ত: দ্বি-জাতি তত্ত্ব মিথ্যা প্রমাণিত করার অজুহাত সৃষ্টির আড়ালে বাঙালিদের মনে অখণ্ড ভারত চেতনার অনুপ্রবেশ ঘটানো। সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যায়ে ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে ১৯৪৭ সাল ও পূর্ববর্তী ঘটনাবলী অস্বীকার করার ভিত্তি তৈরি করা।

তৃতীয়ত: চীনের বিপরীতে ও রাশিয়ার পক্ষে অত্র অঞ্চলে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা বজায় রাখা। এ ব্যাপারে মূলত রাশিয়ার কাছ থেকে চুক্তি মোতাবেক নিজ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা ও সমরাস্ত্র পাওয়ার প্রশ্নটিই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল।

চতুর্থত: বাংলাদেশে একটি বন্ধুভাবাপন্ন দলকে রাজনৈতিক পর্যায়ে সর্বতো উপায়ে সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে টিকিয়ে রাখা। যাতে এ অঞ্চলে ভারতের অনুকূলে ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় থাকে ও পার্শ্ববর্তী ৭টি বিচ্ছিন্নতাবাদ আক্রান্ত রাজ্যের বিদ্রোহ দমানোর জন্য বাংলাদেশকে প্রয়োজনে কাজে লাগানো যায়। এর নিশ্চয়তা বিধানের জন্য 'র'-এর মাধ্যমে সকল পর্যায়ে ভারতীয়করণ প্রক্রিয়া জোরদারকরণ ও বাংলাদেশের নব্য প্রতিষ্ঠিত সরকারের সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়।

অধ্যায়-৫

‘র’-এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যধারা

‘র’- সম্পর্কে স্বভাবতই প্রকাশ্যে কিছু জানা সম্ভব নয়। এমনকি ভারতীয় জনগণও এ সম্পর্কে খুব একটা কিছু জানতে পারেন না। ‘র’ কতো গোপনে কাজ করে সে সম্পর্কে ১৯৯০ সালে ভারতীয় সংসদের বিজেপি দলীয় এমপি শ্রী যশবন্ত সিং-এর মত হচ্ছে, ‘র’-এর সবকিছু এতই গোপনীয় যে, আমার মনে দৃঢ় সন্দেহ, এ এজেন্সি সম্পর্কে সরকারও ভালোভাবে কিছু অবগত আছেন কিনা?[১] ‘র’-এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এর বাৎসরিক বাজেট অত্যন্ত গোপনীয় এবং অপ্রকাশ্য; এমনকি সংসদে পর্যন্ত আলোচিত হতে পারে না।[২] উক্ত পত্রিকা- ‘ইলাসট্রেটেড উইকলি অফ ইন্ডিয়া’য় ‘র’-এর একজন কর্মকর্তার উদ্ধৃতি দিয়ে আরো বলা হয় যে, ‘RAWhas within its ranks every form of specialist from a cobbler to a nuclear scientist’. অর্থাৎ ‘র’-এ কর্মরতদের মধ্যে সকল ধরনের বিশেষজ্ঞ রয়েছেন যাদের মধ্যে মুচি থেকে শুরু করে পারমানবিক বিজ্ঞানীও অন্তর্ভুক্ত থাকেন।

তবে ভারতীয় সাংবাদিক অশোক রায়না লিখিত ‘র’ সম্পর্কে প্রকাশিত একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ ‘Inside RAW: The Story of India’s Secret Sevice-এ ‘র’ সম্পর্কে বেশ কিছু ধারণা পাওয়া যায়। একই সাথে অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন রিপোর্ট ও বিশ্লেষণ থেকে আমরা ‘র’-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে নিম্নলিখিত ধারণা পেতে পারি।

ক। ‘র’-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ

(১) পার্শ্ববর্তী সকল দেশের রাজনৈতিক ও সামরিক ঘটনাবলী ও অবস্থান যা ভারতের জাতীয় নিরাপত্তার সাথে সরাসরি জড়িত এবং ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতিতে যার প্রভাব অবশ্যম্ভাবী সেদিকে লক্ষ্য রাখা।

(২) পাকিস্তানে বিপুল সমরোপকরণ সরবরাহ ‘র’-এর সর্বপ্রধান বিবেচ্য বিষয়।

(৩) চীনের পরিবর্তনশীল ঘটনাবলী ও যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা।

(৪) পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে ভারতীয় একাধিপত্য (Hegemony) কায়েম করা, যাতে অত্র অঞ্চলে অন্য কোনো শক্তির প্রকাশ্য বা পরোক্ষ কোনরূপ ভারত বিরোধী হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা সৃষ্টি না হয়। প্রয়োজনে শ্রীলংকা, মালদ্বীপ ও নেপালে যে ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করা হয়েছিল সে ধরনের পুলিশী ভূমিকা গ্রহণ করা।

(৫) ভারত মহাসাগরসহ সমগ্র উপমহাদেশে ভারতীয় সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার করা।

(৬) পন্ডিত নেহেরুর 'অখণ্ড ভারত মাতা'র কল্পনাবিলাসকে বাস্তবে রূপ দিয়ে বিশ্ব শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হওয়া।

(৭) সর্বশেষ-কিন্তু বিশেষ উদ্দেশ্য হলো যে, বিভিন্ন গোত্রের বিপুলসংখ্যক ভারতীয় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাস করে আসছেন, যারা ঐ দেশের জোরাল অবস্থানে অবস্থান করছেন এবং এ সমস্ত ভারতীয়ের প্রভাব ও চাপে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ভারতের অনুকূলে দৃঢ় সমর্থন জোগাতে পারে। এসব ভারতীয়দের বিভিন্নভাবে কাজে লাগানো 'র'-এর অন্যতম লক্ষ্য। এছাড়া ব্যবসায়ী, সংস্কৃতিকর্মী, সাংবাদিকদের তথ্য সংগ্রহের কাজে লাগানো।

খ। **সাধারণ কর্ম-পদ্ধতি**

(১) বিদেশে ভারতীয় দূতাবাসের ছদ্মাবরণে, কূটনৈতিক সুবিধাকে (Diplomatic Immunity) পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগিয়ে নির্বিঘ্নে গুপ্তচরবৃত্তি পরিচালনা করা। এ ব্যাপারে Miles Copland তার 'The real world of Spies' বইয়ে উল্লেখ করেছেন যে, কোনো সরকারি কর্মকর্তা, তিনি যে কোন পর্যায়েই কর্মরত থাকুন না কেন, যখন তিনি সরাসরি গোয়েন্দাবৃত্তির জন্য তথ্য সংগ্রহ করেন তখন তাকে 'ইন্টেলিজেন্স' কর্মকর্তা বলা যায়। এ সমস্ত কর্মকর্তা হতে পারেন রাষ্ট্রদূত, এ্যাটাশে (সামরিক, নৌ, বিমান), সিভিল এভিয়েশন, বাণিজ্যিক, পেট্রোলিয়াম অথবা কৃষি সংক্রান্ত অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে নিয়োজিত কর্মকর্তা। এমনকি "প্রশাসনিক ও উপদেষ্টার কাজে নিয়োজিত ছাড়া সকল দূতাবাস কর্মকর্তা-কর্মচারীই 'ইন্টেলিজেন্সের' সাথে জড়িত থাকতে পারেন এবং বিভিন্ন দূতাবাসের ছাদে অবস্থিত নানা আকৃতির এন্টেনা তাদের নিজস্ব 'কীর্তি কাহিনী' বলার জন্য যথেষ্ট"।[৩] 'র'-ও এভাবে দূতাবাস কেন্দ্রিক তৎপরতায় জড়িত।

(২) একজন ছাত্র, পর্যটক, সাংবাদিক, বিমানের কর্মকর্তা-কর্মচারী, ব্যবসায়ী অথবা এমনকি একজন শিল্পীকেও বিশেষ প্রশিক্ষণদানের পর পার্শ্ববর্তী দেশে বিশেষ সময়ে বা স্থায়ীভাবে 'র' প্রেরণ করে থাকে।

(৩) বিভিন্ন আকর্ষণীয় মহিলাকে 'র' ইন্টেলিজেন্সে নিয়োগ করে দেশে বা বিদেশের 'টার্গেট'কে তাদের মাধ্যমে ব্ল্যাকমেইল করে থাকে।

(৪) বিএসএফ-এর সাথে মিলিতভাবে সীমান্ত এলাকায় গুপ্তচরবৃত্তি পরিচালনা করাও 'র'-এর অন্যতম কাজ।

(৫) বিভিন্ন দেশের সাথে ভারতের পক্ষে অসম চুক্তি সাধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করায় 'র' বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

(৬) 'টার্গেট দেশের' প্রতিভাবান তরুণ-তরুণীদের মাঝে সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের আড়ালে ভারতীয় চেতনার অনুপ্রবেশ ঘটানোয় এই সংস্থা বরাবরই তৎপর।

অধ্যায়-৬

বাংলাদেশে গুপ্তচরবৃত্তি পরিচালনা সহজ কেন

বাংলাদেশে 'র' কার্যক্রম তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান আমল থেকে ক্রিয়াশীল হলেও তখন তা ছিল আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে। কিন্তু ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বরের পর যখন ইন্দিরা গান্ধীর প্রত্যক্ষ নির্দেশে 'র' বাংলাদেশে তার কর্মকাণ্ড শুরু করে তখন তা ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে। কিন্তু 'আদেশ প্রদানের' পরপরই এক তুড়ি মেরে আজন্ম সংগ্রামী একটি জাতিকে হীনবল করা যায় না বা গুপ্তচরবৃত্তির মাধ্যমে বর্তমান সভ্য বিশ্বে হিটলারের 'গেস্টাপো' কায়দায় কোনো দেশকে সরাসরি দখলে রেখে লন্ডভন্ডও করা সম্ভব নয়। গুপ্তচরবৃত্তির বিস্তৃতি বা ধরন-ধারণ সম্পর্কে আমরা সাধারণত ভাবি যে, 'জেমস্ বন্ড' বা 'মাসুদ রানা'র মতো কিছু স্পাই বা অপারেটিভ কোন দুর্ধর্ষ কাজে নিয়োজিত রয়েছে যারা শত্রু দেশের তথ্য, খবরা-খবর পাচার করছে কিংবা সামরিক ব্যাপারে নজরদারি করছে। কোনো কোনো সময় অবশ্য কিছু ধ্বংসাত্মক কাজকর্মে বিদেশি গুপ্তচরদের সম্পৃক্ততা সম্পর্কে আমরা পত্র-পত্রিকায় খবর পাই। কিন্তু আধুনিক গুপ্তচরবৃত্তি অত্যন্ত ব্যাপক পরিসরে পরিচালিত হয়। এর প্রকৃত ধরন ও ঘটনা সংঘটনের সময় বোঝা বা জানা না গেলেও পরবর্তীতে ধীরে ধীরে তা সীমিত পরিসরে হলেও আলোর মুখ দেখে। আজ থেকে পঁচিশ বছর বছর পূর্বে সিকিম নিয়ে 'র' -এর গৃহীত পদক্ষেপ তখন নেহাতই সিকিমের গণতান্ত্রিক আন্দোলন মনে হলেও এবং ভারত সরকার তার সম্পৃক্ততার কথা তখন অস্বীকার করলেও এখন নিজেরাই তা প্রকাশ করছে। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ শত্রু দেশের মানব-মানবীর একান্ত ব্যক্তিগত গোপনীয় বিষয়টিকেও গুপ্তচরবৃত্তির আওতায় নিয়ন্ত্রণের দাবি করে থাকেন। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, পারিবারিক এমনকি মানবাধিকারের সীমানা পর্যন্ত গুপ্তচরবৃত্তি পরিচালিত হয়ে থাকে। শুধুমাত্র স্পাই বা অপরেটিভের[১] মাধ্যমে কোন দেশের কোনো গুপ্তচর সংস্থার পক্ষে এককভাবে গুপ্তচরবৃত্তি পরিচালনা করা সম্ভব নয়। এ জন্য প্রয়োজন হয় টার্গেট দেশে একদল এজেন্ট,[২] তাবেদার বুদ্ধিজীবী, আমলা, রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, এমনকি কলগার্ল। গণতান্ত্রিক দেশে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা অর্থাৎ এক কথায় মুক্ত পরিবেশে গুপ্তচরবৃত্তি ও তার থাবা বিস্তার করা অত্যন্ত সহজ কিন্তু পরিকল্পিত উপায়ে সেখানে অনেক কিছু অনুধাবন করা গেলেও সরাসরি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। আসলে গুপ্তচরবৃত্তিতে 'আজ যা মিথ্যা, কাল তা সত্য' কিন্তু ততদিনে 'Operation is over'- 'সবকিছু শেষ'। এখন পর্যায়ক্রমিক পর্যালোচনার মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর ওপর আলোকপাত করা যেতে পারে।

(ক) বাংলাদেশে গুপ্তচরবৃত্তি চালানো সহজ কেন?

এই উপমহাদেশে মূলত পাকিস্তান ভারতের প্রধানতম বৈরী দেশ। তাই স্বভাবতই পাকিস্তানে ব্যাপকমাত্রায় গুপ্তচরবৃত্তি চালানোই ভারতের জন্য স্বাভাবিক। কিন্তু পাকিস্তানের জনগণ অন্তত ভারতের 'সদিচ্ছা' সম্পর্কে একমত। তাদের দেশ সামরিক, বেসামরিক যে ধরনের সরকার দ্বারাই পরিচালিত হোক না কেন, পাকিস্তান জানে তার মূল শত্রু কে এবং কেন, কিভাবে 'র' তাদের দেশে কোনো কোনো পর্যায়ে আঘাত হানতে পারে? পাকিস্তানের গুপ্তচর প্রতিষ্ঠান, বেসামরিক আমলা, সামরিক বাহিনী, প্রচার যন্ত্র-সকল ক্ষেত্রে একটি সুসমন্বিত, দীর্ঘদিনের চর্চায় অভিজ্ঞতাসঞ্জাত পেশাদারী মনোভাব গড়ে উঠেছে। দ্বিতীয়ত: পাকিস্তানও কৌশলগত গুপ্তচরবৃত্তি পরিচালনায় সক্ষম। তৃতীয়ত: তাদের জাতীয় নিরাপত্তার ভিত্তি ও তার দুর্বলতা চিহ্নিত। ফলে ভারতীয় বা যেকোন ইন্টেলিজেন্স তৎপরতা সাফল্যের সাথে মোকাবিলার ক্ষমতা তাদের আছে। কিন্তু বিপরীতে বাংলাদেশে জাতীয় নিরাপত্তার যে মৌলিক ভিত্তি জাতীয় ঐকমত্য তা রাজনৈতিক আদর্শের দ্বান্দ্বিকতায় ধোঁয়াটে, সর্বোপরি অর্থনৈতিক এবং সামরিক ক্ষেত্রে অনগ্রসরতার জন্য আমাদের দেশে HIS[৩] এর তৎপরতা নির্বিঘ্নে প্রবহমান থাকা স্বাভাবিক। এর বাইরে আমাদের কোনো সুনির্দিষ্ট নিরাপত্তা নীতি নেই এবং কার পক্ষে কোন পর্যায়ে, কীভাবে, কখন আঘাত আসতে পারে সে ব্যাপারে আমরা এখন পর্যন্ত কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যাপক নীতিমালা প্রণয়ন করতে পারিনি। অন্যদিকে পাকিস্তানের গুপ্তচর প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত সুসংগঠিত ও আক্রমণাত্মক। এছাড়া 'র'-এর লক্ষ্য পাকিস্তানে যেখানে মূলত সামরিক বিষয়াদিতে সীমাবদ্ধ, সেখানে আমাদের দেশে সামরিক ক্ষেত্রটি গৌণ। বরং অনায়াসে যখন সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক পর্যায়ে কিছু প্রভাব বিস্তার করলে বা হুজুগে বাংলাদেশিদের চাবি দিয়ে দম দেওয়া পুতুলের মতো ছেড়ে দিলেই কার্যসিদ্ধি হয়, সেখানে ভারত সঙ্গতকারণেই সামরিক বিষয়াদির চেয়ে অন্যান্য খাতেই নজর দিয়েছে বেশি। কারণ সামরিক পর্যায়ের আগ্রাসী ভীতি প্রদর্শন বা দ্বন্দ্বে জড়িয়ে যাওয়া ভারতের সমর শক্তির জন্য 'Split of the military power' হিসেবে পরিগণিত হবে। এদিকে আমাদের দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ বাঙালি, যাদের ভাষাগত, নৃতত্ত্বগত, সংস্কৃতিগত পরিমণ্ডলে ভারতের পশ্চিম বাংলার সাথে প্রচুর সাযুজ্য রয়েছে। আমরা এখনো বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে পশ্চিম বাংলার সাহিত্যিক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবীদের ওপর নির্ভর করে থাকি। প্রচার মাধ্যমে আমাদের কারিগরি পশ্চাৎপদতা যা মূলত অর্থনৈতিক কারণে দূরতিক্রম্য, সেখানে বিশাল ভারতীয় প্রচার সাম্রাজ্য আমাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করবে এটাই স্বাভাবিক। এছাড়া সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে আধুনিকতার মাদকতা আমাদের তরুণ-যুবকদের কাছে কাম্য হলেও আমরা সুস্থ সাংস্কৃতিক অবয়ব দান করতে পারিনি। ফলে ঐ সুযোগটি গ্রহণ করেছে পশ্চিমবঙ্গীয় আদলের সংস্কৃতি চর্চা ও বোম্বের উলঙ্গ দেহ সর্বস্ব স্যাটেলাইট কালচার। পাকিস্তানের মতো দেশে জনগণের মাঝে প্রচার যন্ত্রের কল্যাণে বেসিক কিছু 'নিরাপত্তা' ও 'কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স' চেতনা ক্রিয়াশীল যা আমাদের এখানে নেই। আবার গুপ্তচরবৃত্তির সকল শাখা-প্রশাখাকে সর্বদা পল্লবিত রাখার জন্যে যে অনুগত শ্রেণির প্রয়োজন হয় তাও

অধ্যায়-৭

বাংলাদেশে 'র' তৎপরতা (১৯৭৬-'৯০)

১৯৯৫ সালে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার একটি দৈনিকের সাথে সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, "বাংলাদেশের রাজনীতিতে ভারতের একটি ভূমিকা রয়েছে"। ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের এই কথায় স্বভাবতই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, বাংলাদেশের রাজনীতিতে ভারতের এই 'একটি ভূমিকা' আসলে কি এবং রাজনীতি যেহেতু রাজনৈতিক দলের মাধ্যমেই পরিচালিত হয়ে থাকে, তাই ভারতীয় ভূমিকায় সহায়তাকারী সেই রাজনৈতিক দল কোনটি?

উপরোক্ত প্রসঙ্গে ২৩ জুলাই ১৯৯৩ সংখ্যা সাপ্তাহিক বিচিত্রা পত্রিকায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধের উল্লেখ করা যায়। 'বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক' শিরোনামের উক্ত নিবন্ধে প্রয়াত সাংবাদিক জনাব শামছুর রহমান উল্লেখ করেছিলেন,

> "পঁচাত্তর-পরবর্তীতে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যা তারা (ভারত) গ্রহণ করেছিল তাতে তাদের মৌলনীতি ছিল দুটি-(১) বাংলাদেশে ভারত অনুগত সরকার প্রতিষ্ঠিত করা এবং ভারতের স্বার্থের বাহক দল ও ব্যক্তিদেরকে আনুকূল্য প্রদান করা এবং (২) প্রথম কৌশল ব্যর্থ হলে বিভিন্নভাবে চাপ ও প্রভাব বিস্তার করে ক্ষমতাসীন সরকারকে নতজানু করানো, যাতে আর্থিক, রাজনৈতিক ও পররাষ্ট্রনীতির বাস্তবায়নে বাংলাদেশ (ভারতের) বাঁধা হয়ে না দাঁড়ায়।"

এ দুই নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ভারত কোন সময়ই পিছপা হয়নি। বিশেষ করে ১৯৬২ সালে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ গঠনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা যেভাবে বাংলাদেশের রাজনীতিতে জড়িয়ে গিয়েছিল '৭৫-এর পট পরিবর্তনে তা বেশ খানিকটা হোঁচট খাওয়ায় তাদের ভিন্ন পথে কিন্তু কৌশলে অগ্রসর হতে হয়। তবে তাই বলে যে ভারত বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ আগ্রাসন চালানোর চিন্তা করেনি তা কিন্তু নয়। বরং এ ব্যাপারে তদানীন্তন ইন্দিরা সরকারের মনোভাব বোঝা যায় স্বয়ং ভারতীয় লেখকদের কথা থেকে।

এদিকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সহায়তা প্রদান করায় 'র' সহজেই এ দেশের সকল পর্যায়ে এজেন্ট তৈরিতে সক্ষম হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তারা এ সকল এজেন্টদের নিষ্ক্রিয় করে দেয়নি। বরং শেখ মুজিব সরকার-যাদের সাথে আপাতদৃষ্টিতে ভারতের সুসম্পর্ক ছিল বলে ধারণা করা হয় সেই মুজিব আমলেও 'র' 'তৎপরতা সমানতালে অব্যাহত ছিল। এমনকি "সে সময় 'র'

এজেন্টরা নব্য স্বাধীন রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিষয়ে নজর রাখা অব্যাহত রাখে"।[১] তবে "স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকেই বাংলাদেশের প্রতি ভারত সরকারের আচরণ ছিল আগ্রাসী মনোভাবাপন্ন। ফলে বাংলাদেশের জনগণ ভারতকে সন্দেহ ও ঘৃণার চোখে দেখতে শুরু করে। এ ঘৃণা ও সন্দেহের কারণে ভারতের সাথেবাংলাদেশের মৈত্রীর ব্যাপার ছিল বিরাট প্রশ্নের সম্মুখীন। '৭১-এর পর সোভিয়েত-মার্কিন সম্পর্কে অবনতি ঘটে। সে সময় গোটা বিশ্ব দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পরস্পর মুখোমুখি ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নের মিত্রশক্তি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। অপরদিকে ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়ায় পরাজয়ের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব এ অঞ্চলে হ্রাস পেতে থাকে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের পরাজয়ে ভারতের আত্ম-অহংকার হঠাৎ করে বেড়ে যায়। একই সাথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মার্কিন পরাজয়ে ভারতের আত্মবিশ্বাস আরো বেড়ে যায়। এই দুই ইচ্ছাশক্তির জোরে ভারত নিজেকে এ অঞ্চলের মুরব্বি হিসেবে গড়ে তুলতে শুরু করে। শুরু হয় তৃতীয় বিশ্বের দারিদ্র্যপীড়িত একটি দেশের বিশাল সমরসজ্জা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে নিজের বলয়ভুক্ত করার সাম্রাজ্যবাদী প্রক্রিয়া।

১৯৭১ সালের পর ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও সেনা কর্মকর্তারা দক্ষিণ এশিয়াসহ অষ্ট্রেলিয়ার জলসীমা পর্যন্ত ভারতের একাধিপত্য কায়েমের মাস্টার প্লান তৈরি করে। সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পাশ্চাত্যের কয়েকটি দেশ এই মাষ্টার প্লান বাস্তবায়নে ভারতকে সকল প্রকার সহযোগিতা দিতে শুরু করে। বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অপচয় করে ভারত অত্যাধুনিক অস্ত্রে নিজেকে সজ্জিত করতে থাকে। এ মাস্টার প্লানের চূড়ান্ত বাস্তবায়নের জন্যে তার প্রয়োজন হয় রাজনৈতিক সমর্থনের। এ লক্ষ্যে প্রতিবেশী দেশগুলোর ওপর স্নায়ুবিক চাপ প্রয়োগের নীতি গ্রহণ করে ভারত। প্রতিবেশী বাংলাদেশ, ভুটান, নেপাল, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ ও পাকিস্তানের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টির কৌশল গ্রহণ করে। মাঠে নামিয়ে দেয় ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'কে। উপরোক্ত দেশগুলোর মধ্যে মালদ্বীপ ও ভুটানের কোন স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি নেই। এরা ভারতীয় বাজারের ক্রেতা। বাকি দেশগুলোর মধ্যে পাকিস্তান একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

স্বাধীনতার পর মুজিব সরকারের ওপর ছিল ভারতের একচ্ছত্র প্রভাব। এ প্রভাব বিস্তার করতে ভারত সরকার আশ্রয় নেয় বিভিন্ন কৌশলের। শেখ মুজিব তার স্বাধীনচেতা ব্যক্তিত্বের জন্য ভারতের এ ধরনের নাক গলানো নীতিতে প্রায়শ বিরক্ত হতেন। ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র' এ কারণে শেখ মুজিবকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতো না। 'র' শেখ মুজিবকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করার কাজে উঠে-পড়ে লাগে। মুজিব মন্ত্রিসভায় কয়েকজন এ সময় 'র'-এর পক্ষে কাজ করত। অত:পর '৭৫-এর ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়"।[২] এ অবস্থায় 'র'-খানিকটা দিশেহারা হয়ে পড়লেও '৭৫ সালের ৩ নভেম্বর আবার তারা বাংলাদেশে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে "... যে পরিস্থিতিতে ও যেভাবে ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থান সংঘটিত হয় (মুজিব হত্যাকান্ডের মাত্র ৮০ দিনের মাথায়), তাতে এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এতে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ গোপন ভারতীয় সমর্থন ছিল"।[৩]

এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় নীতি-নির্ধারকগণ দুটো উপায় অবলম্বনের সিদ্ধান্ত নেন। এর একটি হলো- যেকোনভাবে জে. জিয়াকে উৎখাত করা বা সম্ভব হলে হত্যা করা ও দ্বিতীয়টি হচ্ছে যদি বা যতদিন তা করা সম্ভব বা হয় ততদিন জিয়া প্রশাসনকে বিভিন্নমুখী চাপে ব্যতিব্যস্ত করে রাখা যাতে তারা দেশগড়ায় নজর দিতে না পারেন এবং পক্ষান্তরে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি করা যায় ।

উপরোক্ত সূত্রের আলোকে 'র' প্রথম লক্ষ্যকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ধরে নিয়ে জিয়া প্রশাসনকে বিকল করে তোলায় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে এ ধরনের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি তৎপরতার বিবরণ তুলে ধরা হলো।

কাদেরিয়া বাহিনী সৃষ্টি

বঙ্গবন্ধু নিহত হবার পর তদানীন্তন আ'লীগ নেতা কাদের সিদ্দিকী যিনি বাঘা সিদ্দিকী নামে পরিচিত তিনি জিয়া সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং ভারতে গিয়ে আশ্রয় নেন। উল্লেখ্য যে, কাদের সিদ্দিকীর সাথে 'র'-এর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। 'র'-এর সহযোগিতায় তিনি কীভাবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তথা সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হন তার বিবরণ পাওয়া যায় 'র'-সম্পর্কে লিখিত ভারতীয় লেখক অশোকা রায়নার বইয়ে। 'ইনসাইড 'র'-ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থার অজানা অধ্যায়' শিরোনামের ঐ বইটিতে কাদেরিয়া বাহিনী সৃষ্টি সম্পর্কে বলা হয়- "টাইগার সিদ্দিকী যিনি দেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতিকে চির অম্লান করে রাখার সংকল্প ব্যক্ত করেন। তিনি তার সাথে তখনকার ক্ষয়প্রাপ্ত মুক্তিবাহিনীর ১৬,০০০-২০,০০০ সদস্য নিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে পশ্চিমবঙ্গে এসে আশ্রয় নেন।

টাইগার সিদ্দিকী স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যে সমস্ত 'র' সদস্যের সাথে পরিচিত ছিলেন, তিনি পুনরায় সাহায্য ও নিরাপত্তার আশায় তাদের সাথে যোগাযোগ করেন। বাংলাদেশে তিনি ও তার লোকজন তখন গ্রেফতারের তালিকায় ছিলেন। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী জানা যায় যে, তাড়াহুড়া করে জড়ো হওয়ায় মুক্তি ফৌজের উদ্দেশ্য ছিল 'মুজিববাদ'কে পুনর্জীবিত করা। সিদ্দিকী তার তিনজন সঙ্গীসহ দিল্লিতে যেয়ে ধরনা দিতে থাকেন। তাদের চাহিদা ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সরল প্রকৃতির, যেমন পূর্বের মতো বেসরকারি গোপন সমর্থন প্রদান ও তাদের পুন:সংগঠিত স্বপ্রসাধ পুনর্জীবিত করার জন্য সীমিত সময়ে পরিচালিত হবে। তারা শুধুমাত্র চরম অসুবিধাজনক পরিস্থিতিতেই ভারতীয় আশ্রয়স্থান ব্যবহার করতে পারবেন। এ শর্তে মুক্তিফৌজ রাজি হয়ে যায় কারণ বাংলাদেশ রাইফেলস তাদেরকে কচিৎ কখনো আক্রমণ করতো এবং প্রায় সময় তারা (বিডিআর) নিষ্ক্রিয় থাকতো বললেই চলে। শেখ মুজিবের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা থাকার পাশাপাশি আরেকটি বিশেষ কারণে তারা মুক্তিফৌজকে সাহায্য করতে রাজি হয়েছিলেন, আর তা হচ্ছে, ভারতীয় কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন তথ্য উপাত্তের মাধ্যমে জানতে পারে যে, বাংলাদেশ মিজো গেরিলাদের আশ্রয় দিয়ে চীনাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের সুযোগ দিয়েছে এবং কাদের বাহিনীর মুক্তিসেনারা তাদের ধারণায় এ ধরনের তৎপরতাকে প্রতিহত করার ক্ষমতা রাখে। সুতরাং 'র'-এর মাধ্যমে সিদ্দিকীকে ভারতীয় সরকারের সাহায্য প্রদান অব্যাহত থাকে।"

শান্তিবাহিনী গঠন

শান্তিবাহিনী যে 'র'-এর তত্ত্বাবধানে সৃষ্ট এ নিয়ে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই। এক্ষেত্রেও প্রমাণ হিসেবে ইনসাইড 'র'-বইয়ে উদ্ধৃত তথ্যের উল্লেখ করা যায়। এ ব্যাপারে উক্ত বইয়ে বলা হয়েছে-

"বাংলাদেশের পূর্ব সীমান্তের একদম শেষ পর্যায়ে যেখানে পার্বত্য চট্টগ্রাম অবস্থিত সেখানকার চাকমা গেরিলাদেরও মুক্তিবাহিনীর মতো 'র' সাহায্য করে যাদেরকে এক সময় 'র'-অপারেটিভ ও জাতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সাহায্য করেছিল। চাকমারা ইয়াহিয়া খানের সময় বিদ্রোহী হয়ে উঠতে শুরু করে। পূর্ব পাকিস্তান সরকার কাপ্তাই নদীর ওপর একটি বাঁধ তৈরি করে। ফলে ঐ এলাকার চাকমাদের অন্যস্থানে পুনর্বাসন করা হবে বলে সরিয়ে নেওয়া হয়। কিন্তু বাস্তবে এ পুনর্বাসন কখনো করা হয়নি। বরং এর পরিবর্তে সত্তর দশকে বাঙালি মুসলিম জনগণ দরিদ্র চাকমাদের নিকট হতে সহায় সম্পত্তি ক্রয় আরম্ভ করে এবং এর পরপর ধর্মান্তকরণ প্রক্রিয়াও একই সাথে চলতে থাকে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর চাকমাদের কিছু সময়ের জন্য সাহায্য করা হয়। কিন্তু মুজিব হত্যাকান্ডের পর আবার সেই ধর্মান্তকরণ পুরোদমে আরম্ভ হয়ে যায়। তাই তারা বাধ্য হয়ে সাহায্যের আশায় ভারতে বসবাস শুরু করে। মুক্তিবাহিনীর মতই তারা তাদের পুরনো 'র' কন্টাক্টদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা চালিয়ে যায় এবং অবশেষে যোগাযোগ স্থাপনে সক্ষম হয়।

আগরতলা অতিক্রম করে এসে তারা দরকষাকষি শুরু করে। তাদের পরিবার-পরিজন ও শিশুদের নিরাপত্তা বিধানের দাবি ভারত সরকার মেনে নেন। তারা তাদের নিজ যুদ্ধ চালিয়ে যেতে অত্যন্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। তারা একটি সংকীর্ণ করিডোরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ করে। যার মাধ্যমে তাদের পরিবার-পরিজন ভারতে অনুপ্রবেশ করতে পারে। এদিকে মিজো সমস্যার আশঙ্কা রয়ে যায় কারণ তারা পার্বত্য চট্টগ্রামকে 'আশ্রয় স্থান' হিসাবে ব্যবহার করছিল ও চীনারা তাদের প্রশিক্ষণে নিয়োজিত ছিল। চাকমা উপজাতিদের আকার, আকৃতি ও চেহারা মিজোদের মতো একই রকম থাকায় ও মিজোরা উত্তর-পূর্ব ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন চালাবার জন্য অস্ত্র সজ্জিত হওয়ায় প্রাথমিকভাবে কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হয়। সুতরাং, লালডেঙ্গা- যিনি ১৯৭১ সালে পশ্চিম পাকিস্তানে পালিয়ে গিয়েছিলেন, তার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা চালানো হয় এবং পশ্চিম পাকিস্তানের 'র'-এজেন্টদের সাথে তার আলোচনা সীমিত সন্তোষজনক পর্যায়ে পৌঁছে, যেখানে তিনি 'র'-এজেন্টদের সাথে ইউরোপে যেতে সম্মত হন। পরবর্তীতে 'র'-অপারেটিভদের মাধ্যমে আলোচনা চালিয়ে তাকে দিল্লিতে আনা সম্ভব হয়, যদিও তখন পর্যন্ত কোন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করা সম্ভব হয়নি। এ পর্যায়ে চাকমারা পার্বত্য চট্টগ্রামে বেশি মাত্রায় সক্রিয় হওয়ার পরিবর্তে মিজো বিদ্রোহীদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে ভারতীয় সরকারকে তথ্য সরবরাহের প্রস্তাব দেয় যার পরিবর্তে তারা তাদের পরিবারের জন্য ভারতীয় আশ্রয়ের নিশ্চয়তা চায়। ভারত সরকার এ দাবি মেনে নেন"।[৬] ভারতীয় লেখকের দাবির মুখে চাকমাদের ধর্মান্তকরণের

অধ্যায়-১২

গোয়েন্দা সংস্থার সাবেক মহাপরিচালকদের সাক্ষাৎকার

[গোয়েন্দা বিশ্লেষকদের দৃষ্টিতে বাংলাদেশ বিরোধী 'র' তৎপরতা শিরোনামে একটি ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় দৈনিক ইনকিলাবে ২০০০ সালের অক্টোবর মাসে। দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় লেখক ডি জি এফ আই, এন এস আই-এর সাবেক কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণে সক্ষম হন। এখানে ছ'জন কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার পত্রস্থ করা হলো]

সকল স্তরেই 'র' ক্রমাগত থাবা বিস্তার করে চলেছে। বাংলাদেশে ভারতের লক্ষ্য সর্বব্যাপী, তাই অন্যান্য গুপ্তচর সংস্থা থেকে 'র'-এর তৎপরতা অনেক, অ-নে-ক বেশি

ব্রিগেডিয়ার (অব.) আমিনুল হক, বীর উত্তম
সাবেক মহাপরিচালক, এন এস আই

পৃথিবীর প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি এদেশে গুপ্তচরবৃত্তি চালিয়ে থাকে। তবে সিআইএ, রাশিয়ান ইন্টেলিজেন্স, বৃটিশ এম আই-৬ বা আইএসআই যেই হোক না কেন কারো স্বার্থ এদেশে 'র'-এর মতো ব্যাপক ও সরাসরি নয়। যেহেতু বাংলাদেশে ভারতের লক্ষ্য সর্বব্যাপী তাই স্বভাবতই অন্যান্য দেশের গুপ্তচর সংস্থা থেকে 'র'-এর তৎপরতা এদেশে অনেক, অ-নে-ক বেশি।

বাংলাদেশ বিরোধী গুপ্তচরবৃত্তির প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে গিয়ে এ মন্তব্য করেছেন জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা অর্থাৎ এন এস আই-এর সাবেক মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার (অব.) আমিনুল হক, বীর উত্তম। মুক্তিযুদ্ধ ও সাত নভেম্বরের সিপাহী জনতার বিপ্লবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী ব্রিগেডিয়ার (অব.) আমিনুল হক ১৯৯৪ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে ১৯৯৬-এর মার্চ পর্যন্ত এন এস আই-এর কর্ণধার হিসেবে এদেশে পরিচালিত 'র' তৎপরতা সম্পর্কে ব্যাপক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। 'র'-এর কর্মপরিধি ও অনুপ্রবেশের মাত্রা নিয়ে তার রয়েছে সুস্পষ্ট অভিমত। এ ব্যাপারে দৈনিক ইনকিলাবের পক্ষ থেকে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, বাংলাদেশে এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে 'র' হাত বাড়ায়নি। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক সেক্টর ছাড়াও সামরিক এমনকি ধর্মীয় পর্যায়েও 'র' থাবা বিস্তার করেছে বলে তিনি মনে করেন। এখানে তার সাক্ষাৎকারের পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করা হলো:

প্রশ্ন : আপনি একসময় বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান গোয়েন্দা সংস্থা এনএসআই-এ মহাপরিচালক পদে নিয়োজিত ছিলেন। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে এদেশে ‘র’-এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য কি বলে আপনি মনে করেন?

ব্রিগেডিয়ার আমিনুল : এদেশে ‘র’ এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ব্যাপক। তবে মূল উদ্দেশ্য হলো ভারতের বাংলাভাষী রাজ্য পশ্চিম বাংলা ও বিচ্ছিন্নতাবাদ আক্রান্ত সাতকন্যার মাঝে অবস্থিত বাংলাদেশকে তার (ভারতের) প্রভাব বলয়ে রাখা, যাতে সেখানে ভারত বৈরী কোন শক্তির সাথে এমন কোন সম্পর্ক গড়ে না ওঠে যা এ অঞ্চলে ভারতের আধিপত্য বিস্তারের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। অবশ্য ভারত এজন্য সবসময় ‘বন্ধুভাবাপন্ন’ বাংলাদেশের কথা বলে। আসলে এই ‘বন্ধুভাবাপন্ন’ কথার অর্থ হচ্ছে বাংলাদেশ এমন পররাষ্ট্রনীতি, সমরনীতি গ্রহণ করুক যা ভারতের নীতি আদর্শের সমান্তরাল। এরকম হলে বাংলাদেশ হবে দক্ষিণ এশিয়ায় ক্ষমতার ভারসাম্য ভারতের অনুকূলে রাখার অন্যতম পরিপূরক। ভারত যে বাংলাদেশের গৃহীত আদর্শকে তাদের পক্ষে দেখলেই কেবলমাত্র সন্তুষ্টি প্রকাশ করে থাকে তার অন্যতম উদাহরণ হতে পারে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালীন ভারতীয় সংসদে প্রদত্ত ইন্দিরা গান্ধীর বক্তব্য। উল্লেখ্য, ১৯৭১-এর শেষ দিকে পাক-ভারত যুদ্ধ শুরুর মুহূর্তে ইন্দিরা গান্ধী ভারতীয় পার্লামেন্টে বলেছিলেন, ‘আপনারা জেনে খুশী হবেন যে, বাংলাদেশ সরকার ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রকে তাদের সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছে।’ বলার অপেক্ষা রাখে না এ চার নীতি ছিল ভারতীয় সংবিধানে অনুসৃত নীতির অনুরূপ।

এসব অবস্থা বিশ্লেষণ করে সংক্ষিপ্তাকারে এটাই বলা যায় যে, ভারত চায় বাংলাদেশ তাদের পক্ষে থাকুক। এদেশের পররাষ্ট্রনীতি হোক ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির অনুকূল। এজন্য দরকার একটি বন্ধুপ্রতীম বাংলাদেশ সরকার। এবং সেরকম একটি সরকার গঠন বা ভারতের প্রতি নমনীয় মনোভাব গ্রহণে চাপ প্রয়োগের দায়িত্ব হচ্ছে ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা ‘র’-এর।

প্রশ্ন : ‘র’ বাংলাদেশে কোন কোন সেক্টরে কাজ করে থাকে?

ব্রিগেডিয়ার আমিনুল : ‘র’ কোন কোন সেক্টরে কাজ করে সেটা না বলে বরং এ প্রশ্ন করাই এ্যাপ্রোপিয়েট হবে যে, ‘র’- কোন সেক্টরে কাজ করে না? আমার অভিজ্ঞতা বলে, এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে ‘র’ হাত বাড়ায়নি। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক সেক্টর ছাড়াও সামরিক এমনকি ধর্মীয় পর্যায়েও বাংলাদেশে ‘র’ তার থাবা বিস্তার করেছে। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক অঙ্গনে যেমন ‘র’ সবসময় ভারতীয় আদর্শের সমান্তরাল মতাদর্শ বিস্তারে তৎপর তেমনি শিল্প-সংস্কৃতি-প্রচারণা মাধ্যমেও ‘র’ তৈরি করেছে ভারতীয় ‘মাউথপিস’। এসব সেক্টরে আবার অনিয়মিত এজেন্ট ছাড়াও মাসিক নিয়মিত ভাতা পেয়ে থাকে এ ধরনের এজেন্টের সংখ্যাও কম নয়। যেমন সংবাদ মাধ্যমে ‘র’-এমন প্রভাব বিস্তার করেছে যে, এক্ষেত্রে কতিপয় সংবাদপত্রকে তারা (‘র’) বিভিন্ন গোপন উপায়ে অর্থ বরাদ্দ দিয়ে থাকে। এছাড়া বিভিন্ন কলামিস্টকেও ‘র’ ভাতা দিয়ে, বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ করে দিয়ে বা সম্মানসূচক খেতাব প্রদানের মাধ্যমে তাদের

এদিকে শান্তিবাহিনী বা বঙ্গভূমি ইস্যুর তো 'র'-এর সাহায্য ছাড়া অস্তিত্ব থাকারই কথা নয়। শান্তিবাহিনীর অস্ত্র, গোলাবারুদ, রসদ পত্র এসবের সোর্স বা উৎস কোথায়-এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজলেই ভারতের নাম চলে আসে। বঙ্গভূমি আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তাই। একসময় এটা ছিল 'কাল্পনিক কাহিনী'। কিন্তু পরবর্তীতে 'র'-এর সক্রিয় সাহায্য, সহযোগিতায় এটি মহীরূহে পরিণত হয়।

প্রশ্ন : ডিজিএফআই ও এনএসআই মূলত কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স তৎপরতার সাথেই জড়িত। এক্ষেত্রে বৈদেশিক বা স্ট্রাটেজিক গুপ্তচরবৃত্তি পরিচালনায় বাঁধা কোথায়?
ব্রিগেডিয়ার আমিনুল : আসলে আমাদের দেশে ইন্টেলিজেন্স নিয়ে কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকায় বিভিন্ন এজেন্সির কর্মপরিধি কতটুকু তা বরাবরই বিভিন্ন প্রশ্নের জন্ম দিয়ে থাকে। তবে এক্ষেত্রে পররাষ্ট্রনীতির অনুসরণেই ইন্টেলিজেন্স তৎপরতার সীমানা কতটুকু হবে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব কারো সাথে শত্রুতা নয়'- এ নীতিমালার আলোকে বাংলাদেশ মূলত তার বিরুদ্ধে পরিচালিত তৎপরতা চিহ্নিত ও প্রতিহত করার জন্যই কাজ করে থাকে, কোন দেশের প্রতি আগ্রাসী তৎপরতা চালায় না। তবে টিকে থাকার জন্য আমাদেরও বৈদেশিক বা স্ট্র্যাটেজিক গুপ্তচরবৃত্তি পরিচালনা করা উচিত। এক্ষেত্রে সরকার পরিচালনাকারী রাজনীতিবিদদের আগে জাতীয় ঐক্যমতের ভিত্তিতে নীতিমালা প্রণয়ন করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় অর্থ, লোকবল বরাদ্দ দিতে হবে। যেখানে 'র'-এর বাৎসরিক বরাদ্দ একহাজার কোটি রুপির বেশি, সেখানে এর শতভাগের একভাগ অর্থ দিয়ে আমরা কি করতে পারি?

প্রশ্ন : বিসিএস ক্যাডারের মত পৃথক ইন্টেলিজেন্স ক্যাডারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কিনা?

ব্রগেডিয়ার আমিনুল : হ্যাঁ, পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই ইন্টেলিজেন্স এজেন্সীগুলোর জন্য পৃথক ইন্টেলিজেন্স ক্যাডার রয়েছে। ক্যারিয়ারের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এরা একই পেশায় নিয়োজিত থাকে। আমারও ব্যক্তিগত মত হচ্ছে কার্যকর গুপ্তচরবৃত্তি চাইলে ভিন্ন ক্যাডার থাকা উচিত। তবে এজন্য দরকার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ও সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য।

বাংলাদেশে 'র'-এর অন্যতম লক্ষ্য হলো বন্ধুপ্রতীম দেশগুলোর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে এনে ভারতের উপর নির্ভরশীল করে তোলা

মেজর জেনারেল (অব.) গোলাম কাদের, পিএসসি
সাবেক মহাপরিচালক, এন এস আই

পাকিস্তান বা আইএসআই-এর সাধারণভাবে এমন কোন ক্ষমতা নেই যাতে তারা বাংলাদেশের ব্যাপক ক্ষতি করতে পারে। এছাড়া এদেশে তাদের স্বার্থও হচ্ছে খুবই সীমিত পর্যায়ের। বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ে পাকিস্তান যেভাবে তার নিজ অস্তিত্ব রক্ষায় মহাব্যস্ত সেখানে হাজার মাইল দূরের বাংলাদেশে এসে ভজঘট পাকানো তাদের

সাধ্যের বাইরে। কিন্তু বিপরীত দিকে বাংলাদেশের সীমানার তিন দিক বেষ্টনকারী বিশাল ভারতের পক্ষেই কেবল প্রত্যক্ষভাবে সবদিক থেকে এদেশের প্রতি বৈরীতা প্রদর্শন সম্ভব। এক্ষেত্রে বাংলাদেশে ভারতের স্বার্থও যেমন অত্যন্ত বিস্তৃত তেমনি ভাষা ও নৃতাত্ত্বিক মিল থাকায় তাদের পক্ষে এদেশে গুপ্তচরবৃত্তি চালানো অনেক সহজ। সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে পরিচালিত বিদেশি গুপ্তচর সংস্থার তৎপরতা সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে এ মন্তব্যই করেছেন এন এস আই অর্থাৎ জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থার ভূতপূর্ব মহাপরিচালক মেজর জেনারেল (অব.) গোলাম কাদের।

১৯৯১ সালের প্রথম দিক থেকে ১৯৯৪ সালের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত দেশের অন্যতম গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান হিসেবে দায়িত্বপালনকালীন অভিজ্ঞতার আলোকে 'র' ও এর বাংলাদেশি এজেন্টদের 'ভিনডিকটিভ' হিসেবে উল্লেখ করে তিনি আরো বলেছেন, ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা এ দেশের রাজনীতি, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, শিল্প, গ্যাস, পানিসহ এমন কোন খাত নেই যেখানে তার থাবা বিস্তার করেনি। এ ব্যাপারে দৈনিক ইনকিলাবকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মে. জে. গোলাম কাদের গোয়েন্দা সংস্থায় দায়িত্বপালনকালীন তার অভিজ্ঞতার উল্লেখ করে জানান যে, একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে 'র' তার জন্মলগ্ন থেকে বিশেষ করে ১৯৭১-এর পর বাংলাদেশে বিস্তৃত পরিসরে গুপ্তচর কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে যার মাত্রা বিগত বছরগুলোয় বৃদ্ধি পেয়েছে আশঙ্কাজনকহারে।

এ উপমহাদেশের ক্ষমতার ভারসাম্য, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক মেরুকরণের প্রকৃতি বিবেচনায় বাংলাদেশে 'র'-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে মে. জে. কাদেরের অভিমত হলো- ভারতীয় নীতি-নির্ধারক মহলের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কৌশলগত প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে 'র' গোপন সহায়তা প্রদান করে থাকে। তার মতে, দক্ষিণ এশিয়ায় একাধিপত্য বিস্তারে ভারতীয় কৌশলবিদরা একাডেমিক্যালি যে চিন্তা-চেতনা পোষণ করেন 'র'-এর দায়িত্ব হচ্ছে সেসবের বাস্তবায়নে ইন্টেলিজেন্স তৎপরতা পরিচালনা করা। এক্ষেত্রে 'র'-এর সর্বপ্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সকল পর্যায়ে বাংলাদেশকে ভারতের বাধ্যগত রাখা যাতে এ দেশে সরকার গঠন, দেশ চালনা থেকে শুরু করে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমরনীতিসহ সবক্ষেত্রেই ভারতের আনুকূল্যের উপর নির্ভর করতে হয় । এ ব্যাপারে মে. জে. কাদেরের দৃঢ় বিশ্বাস যে, এ দেশে 'র'-এর অন্যতম লক্ষ্য হলো বন্ধুপ্রতীম দেশগুলোর কাছ থেকে বাংলাদেশকে দূরে সরিয়ে আনা, বন্ধুহীন করে তোলা। যাতে একপর্যায়ে বাধ্য হয়ে বাংলাদেশকে ভারতের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হয়। এক্ষেত্রে ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে মৌলবাদ, তালেবান, উত্তর-পূর্ব ভারতে আইএসআই তৎপরতা ইত্যাদি ইস্যু সৃষ্টি করে বাংলাদেশিদের মধ্যে অপরাধবোধ জাগিয়ে তুলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধির লক্ষ্যে 'র' তৎপরতা চালিয়ে আসছে বলে মে. জে. কাদেরের ধারণা।

এসব লক্ষ্যকে সামনে রেখে 'র' কোন কোন সেক্টরে কাজ করে থাকে এ সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রাক্তন এনএসআই ডিজি জানান যে, এ দেশে 'র'-এর রয়েছে নিজস্ব নেটওয়ার্ক। এছাড়া এজেন্টও রয়েছে অনেক। যাদের মাধ্যমে 'র' বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক খাতের সকল স্তরেই অনুপ্রবেশ করেছে বলে মে. জে. কাদেরের অভিমত। এক্ষেত্রে

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উল্লেখ করে তিনি বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর অনেক নেতা, তাদের আত্মীয়-স্বজন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 'র'-এর সাথে জড়িত রয়েছে। এসব রাজনীতিবিদ ছাড়াও সাংস্কৃতিক, ব্যবসায়িক, সরকারি প্রশাসনিক ও প্রচারণা মাধ্যমে নিয়োজিত এজেন্টদের মাধ্যমে 'র' খুব সহজেই দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য যেমন গার্মেন্টস, পাট, তেল, গ্যাস- সকল প্রকার খনিজ সম্পদ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করছে অনেকটা বাধাহীনভাবে। এরূপ তথ্য আদায়ের ক্ষেত্রে এমনও লক্ষ্য করা গেছে যেখানে 'র'- দূতাবাস কর্মকর্তাদের স্ত্রীকেও কাজে লাগিয়েছে প্রশিক্ষিত অপারেটিভ হিসেবে। এ পর্যায়ে তার কার্যকালে বাংলাদেশে 'র'-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্ত্রীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে মে. জে. কাদের বলেছেন, 'র' প্রায়শই কর্মকর্তার স্ত্রীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে গুপ্তচরবৃত্তিতে কাজে লাগায়। ১৯৯- এর পর বাংলাদেশে দায়িত্বপ্রাপ্ত 'র' কর্মকর্তা যিনি কূটনীতিবিদের আবরণে কাজ করতেন তার স্ত্রীকেও সেসময় অনেক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকতে দেখা যেতো। তিনি ভালো নাচতেও পারতেন। ফলে সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে সরকারি ও বিরোধী দলের অনেকের সাথে পরিচিত হওয়া সেই কর্মকর্তা ও তার স্ত্রীর পক্ষে সহজ হয়ে উঠতো। এভাবেই তারা কৌশলে পেয়ে যেতেন বিভিন্ন তথ্য, বুঝতে পারতেন সরকারের মনোভাব। আবার ক্ষেত্রবিশেষে সম্পর্ক তৈরি করে একসময় ভারতীয় বাণিজ্যিক স্বার্থ আদায় করে নিতেন কোন মন্ত্রী বা এমপি'র কাছ থেকে। মোটকথা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নামে 'র' এ দেশের শীর্ষ পর্যায়ে যোগাযোগ গড়ে তুলতো কারো সন্দেহের উদ্রেক না করে।

এদিকে শুধু যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক পর্যায়েই 'র' অনুপ্রবেশ করেছে তা নয় বরং মে. জে. কাদেরের দেওয়া তথ্য মতে, ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা বরাবরই বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ। এক্ষেত্রে সশস্ত্রবাহিনীর নতুন কোন স্থাপনা, গবেষণামূলক তৎপরতা, কর্মকর্তা-সৈনিকদের মনোভাব, সমরাস্ত্র সংগ্রহ, ভারত বৈরী দেশের সাথে সামরিক চুক্তি ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহের ব্যাপক তৎপরতা চালিয়ে থাকে। তবে তিনি মনে করেন, সশস্ত্র বাহিনীর চাকরিরত সদস্যদের মধ্যে 'র' কখনোই সাফল্যের সাথে অনুপ্রবেশ করতে পারেনি। তাই তারা ('র') অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অনেককে ব্যবসা পাইয়ে দিয়ে বা ভিন্ন কোন পথে সুবিধা দিয়ে তাদের পক্ষে কাজ করাতে চেষ্টা চালিয়ে থাকে। সশস্ত্রবাহিনীর পাশাপাশি 'র' যে বাংলাদেশি ইন্টেলিজেন্সেও অনুপ্রবেশ করেনি তা নয়। সীমিত হলেও লোয়ার লেবেলে 'র' অনুপ্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে বলে মে. জে. কাদের মনে করেন।

এ পর্যায়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মাঝে 'র'-এর অনুপ্রবেশ, বিশেষ করে কোন দলে অনুপ্রবেশের মাত্রা বেশি কিনা, প্রশ্ন করা হলে মে. জে. কাদের 'সঙ্গত' কারণেই খোলাখুলিভাবে কোনরূপ মন্তব্য না করলেও এমত প্রকাশ করেন যে, প্রায় সকল রাজনৈতিক দলেই কমবেশি 'র'-এর এজেন্ট রয়েছে। তবে তিনি বলেন, এদের সংখ্যা একটি বিশেষ দলে সবচেয়ে বেশি যেখানে 'র' প্রায়শই কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এক্ষেত্রে একটি সংসদ নির্বাচনে ঐ দলের এমপি মনোনয়ন দেওয়ায় 'র'

একজনের পক্ষে সুপারিশ করে বলে তিনি উল্লেখ করেন। অবশ্য এ সম্ভাবনাও তিনি উড়িয়ে দেননি যে, জাতীয়তাবাদী বলে চিহ্নিত রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যেও 'র'-অনুপ্রবেশে সক্ষম হয়েছে।

এদিকে এন এস আই ও ডি জি এফ আই বাংলাদেশে মূলত কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স তৎপরতা চালালেও বৈদেশিক বা কৌশলগত গুপ্তচরবৃত্তি পরিচালনায় বাধা কোথায় এ সম্পর্কে জানতে চাইলে মে. জে. কাদের বলেন, আমাদের সে যোগ্যতা থাকলেও মূলত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত না থাকায় এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কারণ, এন এস আই বা ডি জি এফ আই-এর প্রধান বা এর কর্মকর্তারা তো নিজ থেকে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। বরং সরকারি নির্দেশনা বা আরো ব্যাপকার্থে এতদসংক্রান্ত জাতীয় নীতিমালা থাকলেই কেবল বৈদেশিক বা কৌশলগত পর্যায়ে গুপ্তচরবৃত্তি পরিচালনা করা যাবে। তবে এক্ষেত্রে সম্পদের সীমাবদ্ধতা বা প্রয়োজনীয় ফান্ডের অভাবও একটি অন্যতম কারণ। সবচেয়ে বড়কথা এজেন্সিগুলোকে রাজনৈতিক কারণে ব্যবহার না করে জাতীয় স্বার্থরক্ষায় কাজে লাগালে এ ধরনের সমস্যার স্বাভাবিকভাবেই সমাধান হয়ে যায়।

সবশেষে মে. জে. কাদের বাংলাদেশে পরিচালিত 'র' তৎপরতার ব্যাপকতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেও ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা ও এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দেশপ্রেম এবং দায়িত্ববোধের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'র'-তাদের দেশের স্বার্থরক্ষায় জাতীয় নীতি-নির্ধারকদের প্রণীত পরিকল্পনানুযায়ী নিষ্ঠার সাথে কাজ করে থাকে। যা তাদের দেশপ্রেমের পরিচায়ক। এছাড়া ভারতীয় পররাষ্ট্র ক্যাডারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারাও 'র'কে যাবতীয় উপায়ে সাহায্য-সহযোগিতা করে বলে তিনি জানান। অথচ, তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা মতে, বাংলাদেশে এমন সহযোগিতামূলক পরিবেশ এখনো সৃষ্টি হয়নি।

'র'-এর লক্ষ্য হলো সব ব্যাপারে বাংলাদেশকে ভারতের উপর নির্ভরশীল করে তোলা ও মুসলিম দেশসমূহের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা

মেজর জেনারেল (অব.) এম এ হালিম, পিএসসি
সাবেক মহাপরিচালক, ডি জি এফ আই

বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি ও বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে ডি জি এফ আই-এর মহাপরিচালকসহ ঐ সংস্থার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালনকারী মেজর জেনারেল (অব.) এম এ হালিম, পিএসসি বলেছেন, বাংলাদেশে ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা 'র'-এর লক্ষ্য হলো বাংলাদেশে ভারতীয় প্রভাব বিস্তার করা ও সব ব্যাপারে বাংলাদেশকে ভারতের ওপর নির্ভরশীল করে তোলা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা মে. জে. হালিম আরও মনে করেন,

মুক্তিযুদ্ধে সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করলেও 'র' বর্তমানে বাংলাদেশের জনগণকে ভারত অনুরাগী করে গড়ে তুলে তাদের প্রভাব বলয়ের মধ্যে নিয়ে আসায় ব্যাপক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া তার মতে, ইসলামপন্থীদের স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি হিসেবে প্রচার করার পাশাপাশি বাংলাদেশকে মুসলিম দেশসমূহের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা হচ্ছে 'র'-এর অন্যতম লক্ষ্য।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের অন্যতম গোয়েন্দা সংস্থা ডি জি এফ আই বা প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরে ১৯৯২ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালনকারী মে. জে. হালিম বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে ১৯৯৬ সালের ১৯ আগস্ট মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। ডি জি এফ আই-এর এই শীর্ষপদে ১৪ সেপ্টেম্বর '৯৮ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন ছাড়াও তিনি ১৯৯৪ সালের ৩১ আগস্ট থেকে ১৭ এপ্রিল '৯৫ পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালকরূপে বাংলাদেশে 'র'-এর তৎপরতার অনেক গোপন বিষয় জানার সুযোগ লাভ করেন। অবশ্য ১৯৪৩ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর গোপালগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণকারী ও '৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ৮ নম্বর সেক্টর এবং জেড ফোর্সের অধীনে যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রণকারী মে. জে. হালিম ইতোপূর্বে ১৪ ডিসেম্বর '৯১ তারিখে ডিজিএফআইতে যোগদান করেন পরিচালক- এফ এস আই বি হিসেবে। পরবর্তীতে তিনি পালাক্রমে পরিচালক সি আই বি (কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো), উপ-মহাপরিচালক ও ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করে বাংলাদেশে বিদেশি গুপ্তচর সংস্থাসমূহের তৎপরতা সম্পর্কে জানতে পারেন বিস্তৃত পরিসরে।

সম্প্রতি বাংলাদেশে পরিচালিত 'র'-এর তৎপরতা সম্পর্কে জানতে চাইলে মে. জে. এম এ হালিম দৈনিক ইনকিলাবকে একটি বিস্তৃত সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। এখানে সাক্ষাৎকারের পূর্ণ বিবরণ উপস্থাপন করা হলো:

প্রশ্ন : আপনি একসময় বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান গোয়েন্দা সংস্থা-ডি জি এফ আই'তে মহাপরিচালক পদে নিয়োজিত ছিলেন। সে অভিজ্ঞতার আলোকে এদেশে 'র'-এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য কি বলে মনে করেন?

মে. জে. হালিম : ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা 'র' গঠিত হয় ১৯৬৮ সালে। 'র' গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল বহির্বিশ্বে, বিশেষ করে ভারতের পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করা ও তার বিশ্লেষণ করা। ভারত আঞ্চলিক সুপার পাওয়ার হিসেবে সবসময়ই তার প্রতিবেশী দেশসমূহের ওপর প্রভাব বিস্তার করে বলয় সৃষ্টি করতে চায়। সে আরও চায় এতদঞ্চলে 'বড় ভাই'-এর ভূমিকা পালন করতে। ভারতের এই যে সম্প্রসারণবাদী নীতি তার বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই 'র' কার্যক্রম চালিয়ে থাকে।

বাংলাদেশ ভারতের পার্শ্ববর্তী একটি ক্ষুদ্র দেশ, তিনদিকে ভারত দ্বারা বেষ্টিত। এখানে 'র'-এর লক্ষ্য হলো প্রভাব বিস্তার করা ও বাংলাদেশকে তাদের বলয়ের মধ্যে নিয়ে আসা। মুক্তিযুদ্ধে সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করলেও 'র' চায় বাংলাদেশকে সব ব্যাপারে ভারতের ওপর নির্ভরশীল করে তুলতে, যেখানে জনগণও হয়ে উঠবে ভারতের

প্রশ্ন : জানা মতে ডি জি এফ আই ও এনএস আই মূলত কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স তৎপরতা চালিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বৈদেশিক বা স্ট্রাটেজিক গুপ্তচরবৃত্তি চালানোয় বাধা কোথায়?

মে. জে. হালিম : কোন বাধা নেই। ডি জি এফ আই এবং এন এস আই'তে একটি শাখা রয়েছে এই ধরনের কার্যক্রম চালানোর জন্য। কিন্তু এদের কার্যক্ষমতা খুবই সীমিত। দক্ষ জনবলের অভাব ও আধুনিক যন্ত্রপাতির স্বল্পতার কারণে এই শাখার কার্যক্রম খুব একটা আশানুরূপ নয়। বৈদেশিক গুপ্তচরবৃত্তি চালানো খুব সহজ ব্যাপার নয়। এখানে প্রতিকূল পরিবেশে ও অনেক বাধা-বিপত্তির মধ্যে কাজ করতে হয়। এ জন্য দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনবলের প্রয়োজন। তাছাড়া কোন সরকার গোয়েন্দা সংস্থার এই দিকটায় কখনো কোন মনযোগ দেয়নি। তারা সরকারবিরোধী রাজনীতির খবরাখবর নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। এছাড়া বৈদেশিক গোয়েন্দা কার্যক্রম নির্ভর করে একটি রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি, দেশের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান (Geo Political Situation) এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মনোভাবের ওপর। এই সকল বিষয় বিচার বিশ্লেষণ করে জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থকে সামনে রেখে জাতীয় নিরাপত্তা নীতি প্রণয়ন করা হয়। গোয়েন্দা সংস্থা সেই নীতির আলোকে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। কিন্তু আমাদের দেশে গোয়েন্দা সংস্থার কাছে এই রূপ কোন সরকারি নীতি বা নির্দেশনা নেই। সুষ্ঠু গোয়েন্দা কার্যক্রমের জন্য এরূপ নীতি থাকা খুবই প্রয়োজন।

<u>আওয়ামী লীগের মধ্যে ‘র’-এর অনুপ্রবেশ সবচেয়ে বেশি</u>

‘র’ সর্বপ্রথমে অনুপ্রবেশ করেছে সংস্কৃতির মায়াবী পথ ধরে, তারপর ক্রমশ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে শিক্ষাঙ্গনে এবং কালক্রমে তার ব্যাপ্তি ও প্রসার ঘটেছে আমাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অঙ্গনে

মেজর জেনারেল (অব.) এম এ মতিন, বীর প্রতীক, পিএসসি
সাবেক মহাপরিচালক, ডি জি এফ আই

বর্তমান পৃথিবীতে সরাসরি সৈন্য-সামন্ত পাঠিয়ে শক্তি প্রয়োগ করে প্রতিবেশী দুর্বল রাষ্ট্র দখল করে নেওয়ার পরিবর্তে পরম হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু সেজে একই উদ্দেশ্য সাধনের কৌশল এখন আধিপত্যবাদী শক্তির মোক্ষম হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। আর সে কৌশলের অংশ হিসেবেই আধিপত্যবাদী শক্তি সে দেশের বুকে প্রতিষ্ঠিত করে তাদের আজ্ঞাবহ এক পুতুল সরকার এবং ক্রমান্বয়ে তাদের মাধ্যমেই সে দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতিসহ অন্য সকল ক্ষেত্রে সৃষ্টি করা হয় অচলাবস্থার। সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে পরিচালিত ‘র’ তৎপরতা সম্পর্কে জানতে চাইলে এ মন্তব্য করেন ডি জি এফ আই বা প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক মেজর জেনারেল (অব.) এম এ মতিন, বীর প্রতীক, পিএসসি।

বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতির এক চরম ক্রান্তিলগ্নে যখন ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থার তৎপরতা সকল সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিল তখন তিনি ডি জি এফ আই-এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন **১৯৯৬** সালের ৭ মার্চ। তাই স্বভাবতই তাকে মোকাবিলা করতে হয়েছে 'র' পরিচালিত আগ্রাসী গুপ্তচরবৃত্তির সকল স্তর। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মাঝে 'র'-এর অনুপ্রবেশ নিয়েও মে. জে. মতিনের রয়েছে সুস্পষ্ট অভিমত। মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী এই সেনা কর্মকর্তা মনে করেন দেশের প্রায় সকল রাজনৈতিক দলের মধ্যেই 'র'-এর এজেন্ট রয়েছে এ কথা নির্মম সত্য। তবে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলে 'র'-এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব সীমাহীন এবং তার মতে সেই দলটি হচ্ছে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি বলে দাবিদার আওয়ামী লীগ।

বাংলাদেশে পরিচালিত 'র' তৎপরতা সম্পর্কে দৈনিক ইনকিলাবের পক্ষ থেকে মে. জে. মতিনের কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি এ ব্যাপারে একটি বিস্তৃত সাক্ষাৎকার প্রদান করেন।

প্রশ্ন : আপনি এক সময় বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান গোয়েন্দা সংস্থা ডি জি এফ আই'তে মহাপরিচালক পদে নিয়োজিত ছিলেন। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে এ দেশে 'র'-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি বলে আপনি মনে করেন?

মে. জে. মতিন : আমি খুব কম সময়ের জন্য (মার্চ থেকে আগস্ট **১৯৯৬**) এ দেশের প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থা ডি জি এফ আই-এর মহাপরিচালক পদে অধিষ্ঠিত ছিলাম। আমার নিয়োগকাল দীর্ঘ না হলেও সময়টা ছিল ঘটনাবহুল, আর তাই আমার অভিজ্ঞতার প্রসার বা ব্যাপ্তি ছিল ব্যাপক। একজন প্রাক্তন 'ডিজি- ডি জি এফ আই' হিসেবে লব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে আমি বলতে চাই, আমাদের দেশে 'র'-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সাময়িক ও সুদূরপ্রসারী এ দু'ভাগে ভাগ করা যায়। সাময়িক উদ্দেশ্য হচ্ছে : এ দেশের মাটি ও মানুষকে ভারতমুখী ও ভারতনির্ভর করে তোলা এবং একই সাথে এ দেশকে বাইরের কোন শক্তি বিশেষ করে পাকিস্তানের প্রভাব বলয় থেকে সদা মুক্ত রাখা। অন্যদিকে সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য হচ্ছে: To implement the Indian version of the Monroe Doctrine which New Delhi has been pursuing in practice in order to spread an Indian umbrella on the plea of regional security over all of South Asia অর্থাৎ আঞ্চলিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের নামে সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতীয় প্রভাব বলয়ের বিস্তার সাধনকল্পে 'মনরো ডকট্রিন' (মার্কিন প্রেসিডেন্ট জেমস মনরো কর্তৃক অনুসৃত মতবাদ)-এর অনুরূপ নিউ দিল্লি কর্তৃক অনুসৃত ডকট্রিন বা মতবাদকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে কাজ করা।

প্রশ্ন : 'র' বাংলাদেশে কীভাবে, কোন সেক্টরে কাজ করে থাকে?

মে. জে. মতিন : সময়ের পরিবর্তনের সাথে আধিপত্যবাদী আগ্রাসী শক্তি কর্তৃক দুর্বল ও অপেক্ষাকৃত ছোট প্রতিবেশী রাষ্ট্রের স্বাধীনতা হরণের কলাকৌশলও পালটে গেছে। সরাসরি সৈন্যসামন্ত পাঠিয়ে শক্তি প্রয়োগ করে প্রতিবেশী দুর্বল রাষ্ট্র দখল করে নেওয়ার পরিবর্তে পরম হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু সেজে একই উদ্দেশ্য সাধনের কৌশল এখন